# উরাতীয়া

## সমরেশ বসু

This Book Downloaded From
http://Doridro.com

যখন বেলা পড়ে আসত, সারাদিনের রোদজ্বলা আকাশটায় ছড়াত রং-এর তীব্র ছটা, জনহীন হয়ে আসত মাঠ ও বন, তখন মনে হত রেললাইনের উঁচু জমিটা আরও উঁচু হয়ে উঠেছে। যেন সারাদিন পরে নুয়ে পড়া মাথাটা আড়মোড়া ভেঙে তুলে ধরেছে আকাশের দিকে। আর গাঢ় বর্ণের আকাশটা যেন নেমে আসত একটু একটু করে। আকাশটাই ঘিরে থাকত উঁচু জমিটাকে।

তখন, দূর থেকে মনে হ'ত দুটো অতিকায় দানব নেমে এসে মুখোমুখি দাঁড়িয়েছে ঐ উঁচু জমিতে। বিশ্ব সংসারের এ নির্জনতার সুযোগে তারা নেমে এসেছে ধরাতলে। আকাশের অনেকখানি জুড়ে থাকত তাদের বিশাল দেহ। তাদের স্ফীত সুগঠিত মাংসপেশীর প্রতিটি সুস্পষ্ট রেখা ঢেউ দিয়ে উঠত আকাশের বুকে। তারপর, যখন তারা হঠাৎ খানিকটা সরে গিয়ে, ঝুঁকে পড়ে দাঁড়াত মুখোমুখি, এবং পরস্পরকে আচমকা আক্রমণ করে উঠে পড়ত, তখন শক্তি প্রয়োগে মাংসপেশীগুলি আরও উদ্দাম হয়ে উঠত। আকাশের বুকে ছিটকে যেত ধুলো মাটি। উঁচু জমিটা যেন থরথর করে কাঁপত তাদের দেহ ও পায়ের চাপে। তখন প্রাগৈতিহাসিক যুগের একটা ভয়ঙ্কর দৃশ্যের অবতারণা হত সন্ধ্যাকালের এ জমিটার উপরে।

তারপর এ লড়াই চলতে চলতে রং-এ রং-এ আকাশটা যখন কালো হয়ে আসে, জমি আর আকাশ হয়ে যায় একাকার তখন তারা দুজনেই আকাশ মাটির সঙ্গে একাত্ম হয়ে হারিয়ে যায়।

এমনি ঘটে রোজই। লড়িয়ে দু'জন দুই মস্ত মল্লবীর। লাখপতি আর ঘামারি। তারা দুজনেই রেলওয়ে গেটম্যান।

মফঃস্বল শহর থেকে মাইল সাত আটেক দূরে স্থানীয় স্টেশন থেকেও প্রায় দু'মাইল দূরে, মাঠের মাঝে এ ক্রসিং গেট। লাইনের পুবদিকে গ্রাম কিছুটা আছে। পশ্চিমের গ্রামটা একটা ঝাপসা কালো রেখায় মিশে থাকে আকাশের গায়ে। গেটের দু'দিকে দুটো ঢালু সড়ক নেমে গেছে এঁকে বেঁকে, হারিয়ে গেছে মাঠ ও গ্রামের মধ্যে। চওড়া সড়ক। গরুর গাড়ির চাকার দাগে দুপাশে গভীর রেখা পড়েছে। আর

চারপাশে সবুজ ফসলের ক্ষেত।

ক্রসিং-এর দুপাশে ঢালু জমিতেই গেটম্যানদের ঘর। এমনভাবে ঘরদুটো তৈরি হয়েছে, রেল লাইনের উপর থেকেই লাফিয়ে ঘরের ছাদে চলে যাওয়া যায়। এপার থেকে ওপারের ঘর দেখা যায় না, ওপার থেকে এপারের না।

কাছাকাছি কোন বড় গাছপালা নেই। পাখির জটলা বড় একটা শোনা যায় না। এখানে সারাদিন প্রজাপতি ফড়িং রঙিন পাখা মেলে অবাধে উড়ে বেড়ায়। ঝিঁঝির গলা ফাটানো ডাক আরও ভারি করে তোলে নৈঃশব্দকে।

সারাদিন লোকেরও যাতায়াত কম এ পথে। সকালে আর বিকালে দেখা যায় কিছু লোককে যেতে। হয়ত যায় কয়েকটা গরুর গাড়ি সারাদিনে। তাও গরুর গাড়িগুলোকে অধিকাংশ দিনই বেশ খানিকক্ষণ ধরে দাঁড়িয়ে থাকতে হয় কেননা এই সীমান্তের যারা প্রহরী লাখপতি আর ঘামারি, তাদের যতক্ষণ দয়া না হবে, ততক্ষণ সীমান্তদ্বার খোলার কোন উপায় নেই।

তারা অবশ্য লোক খারাপ নয়। কিন্তু এই নির্জন গ্রামের সীমানায়, চাকরি ছাড়া জীবন-ধারণের যে আর মাত্র একটি দিক তাদের আছে, তা হল মল্লযুদ্ধ। সেজন্য দেহ তৈরি কাজটি তাদের সর্বাগ্রে। যখন ঘণ্টার পর ঘণ্টা তাদের তৈল মর্দনের সময় কিংবা সকালের বুকডন বৈঠকের উত্তেজনায় চোখ লাল, মাথাটা অবসাদগ্রস্ত আর দেহের শিরায় শিরায় রক্তপ্রবাহ পাগলা গতিতে থাকে লাফাতে, তখন পাচন বাড়ি হাতে কোন গাড়োয়ানের খোলেন গো পবন-পো শব্দ তাদের কানেই ঢোকে না।

পবন-পো কথাটি খুব শ্রদ্ধা ও ভয়ের সঙ্গেই গাঁয়ের লোকে তাদের বলে। তারাও সাগ্রহে ও আত্মসন্তোষের সঙ্গে এই সম্মান গ্রহণ করে। কেননা পবন পুত্র বলতে ভীম এবং হনুমানকেই নাকি বুঝিয়ে থাকে। লাখপতি আর ঘামারি, পরস্পরকে তারা ঐ শক্তিমান বীর দুজনেরই অংশবিশেষ বলে মনে করে। আর দুই বীরেরই পূজারী তারা। বজরংবলী তাদের দেবতা। অর্থাৎ বীর শ্রেষ্ঠ হনুমান।

কথাটা মিথ্যে নয়।

এই নির্জন পরিবেশে, লোকালয়ের বাইরে, দূর প্রান্তরে তারা দুই বন্ধু যেন গহন অরণ্যের দুটি জীব। এখানে এই পরিবেশে তারা একাত্ম ও মুক্ত।

লাখপতি এখানে এসেছিল তার বিশ বছর বয়সে। ঘামারি তার চেয়ে বড় বছর দুয়েকের। আজ দশ বছর ধরে তারা একত্র রয়েছে। এই দশ বছরের মধ্যে তারা কখনও ফারাক হয়নি। এই দশ বছরের মধ্যে পৃথিবীতে হয়েছে অনেক ওলটপালট। অনেক রাজ্য ভেঙেছে গড়েছে। অনেক মানুষ বেঁচেছে মরেছে। নদী ভিন্ন পথ ধরেছে, ঘটে গেছে ভৌগোলিক পরিবর্তন। এমন কি ঐ দূরের গ্রামগুলিতেও

পরিবর্তন হয়েছে কিছু কিছু। কিন্তু এখানে কোন পরিবর্তন নেই। উদার আকাশের তলায় এই নির্জন লেবেল ক্রসিং-এর দু-পাশে যেন পৃথিবীর কোন দুর্গম অঞ্চলের প্রাগৈতিহাসিকতা বিরাজিত।

পরিবর্তন যেটুকু হয়েছে, সেটুকু লাখপতি আর ঘামারির দেহে ও রক্তে। দিনে দিনে তাদের দেহের রূপ বদলেছে। সঞ্চিত হয়েছে রক্ত, স্ফিত হয়েছে মাংসপেশী। এখন ক্রমে বাধাহীন হয়ে উঠেছে যেন তাদের রক্তপ্রবাহ। দেহের মধ্যে সে অস্থির, প্রতি মুহূর্তে একটা ভয়ঙ্কর বন্যতা ফেটে পড়তে চাইছে। ক্রমশ অধ্যবসায়ে একদিন যা ছিল কোমল সুন্দর ও সুগঠিত, আজ তা বন্য পাহাড়ের মত খোঁচা খোঁচা পাথর। তাদের প্রেম, ভালবাসা, তাদের হাসিখুশি, আলাপ আলোচনা সব এই দেহকে ঘিরে। এই দেহ ও পরস্পরের সঙ্গে মল্লযুদ্ধই বন্ধুত্ব। আর দিনে দিনে পরিবর্তন হয়েছে রেললাইনের তারের বেড়ার বাইরে তাদের মল্লভূমির প্রশস্ত স্থানটুকুর। সেই মাটিটুকুকেও তারা দেহের মত ভালবাসে, দেহের মতই তার সেবা করে, তার প্রতিটি কণাকে তৈরি করে। এই মাটিতে তাদেরই গায়ের গন্ধ, তাদেরই ঘামে তাদেরই উত্তাপে শুকনো ও ঝুরঝুরে।

এবেলা ওবেলা দিনে ও রাত্রে কয়েকবার করে নিশান দেখানো, দেখানো নীল আলো, তাদের কাছে কোন কাজই নয়। মাসে তারা একবার করে সাত আট মাইল দূরের জংশন স্টেশনে যায় মাইনে আনতে। খোরাকি ও দরকারী বস্তু কিনে নিয়ে আসে তখনই। বাদ বাকী দরকার দিনে একবার করে গাঁয়ে গেলেই মিটে যায়। তাদের দুজনের দুটো গরু আছে। কিনতে হয়নি, দিয়েছে পুষতে না পারা হা-ভাতে গাঁয়ের লোকেরা। গরু পুষতেও তাদের ভাবতে হয় না। লাইনের ধারে বেঁধে দিলেই জীব দুটির পেট ভরে। রাত্রে কিছু জাব আর জল। তাইতেই দুধটা তাদের লাভ। সকালের দুধটা একজন এসে নিয়ে যায়। বিকালের দুধ তারা তাদের কুস্তির পর, জলের মত কাঁচা-ই পান করে। রাঁধে খায় একসঙ্গে, রাত্রে শোয় আলাদা।

সকাল থেকে রাত্রি পর্যন্ত, এই কাজগুলি সামান্য। কিন্তু, এই নির্জন পরিবেশে যা একদিন প্রয়োজনের জন্য তারা আরম্ভ করেছিল আজ তা দারুণ নেশার মত জড়িয়ে ধরেছে রক্তের মধ্যে। অসামান্য হল দেহচর্চা। রাত পোহালেই রক্তপ্রবাহে জাগে কলরোল। দেহের মধ্যে আছে তাদেরই অপরিচিত আর একটা খ্যাপা জীব। সময়ের একটু এদিক ওদিক হলে, প্রতিটি ধমনীতে সে পাগলের মত খোঁচাতে থাকে, ছুটোছুটি করে।

তখন আর চুপ করে বসে থাকা যায় না। তখনি ল্যাঙট এঁটে, তুলসী মঞ্চের গর্তে সযত্নে রক্ষিত হনুমানের ছোট্ট মূর্তিটিকে নমস্কার করে বুকডন বৈঠকে মেতে যায় তারা। বিকাল না হতেই আবার সেই বজরংবলীর পূজা, তৈল মর্দন, ব্যায়াম ও মল্লযুদ্ধ। মল্লযুদ্ধের শেষে দুধের মধ্যে বাটা সিদ্ধি মিশিয়ে খায়। খেয়ে গরিলার মত

রক্তবর্ণ দুটো চোখে স্নেহ ও সোহাগ ভরে দেখে শুধু নিজেদের দেহ। যেন তাদেরই পোষা দুটি অতি স্নেহের জীব এই দেহ দুটি।

এই সময়ে তাদের অতি ভয়ঙ্কর দেখায়। মাথা আর ঘাড় তাদের সমান হয়ে উঠেছে। কোথাও যেন উঁচু নীচু নেই। কান দুটোও আঘাতে আঘাতে দুমড়ে চেপ্টে যেন অনেকখানি মিশে গেছে। মল্লবীরদের নিয়ম তাই। কান পিটিয়ে পিটিয়ে একটা ড্যালা ডুমড়ি গোছের করে ফেলতে হয়। সেই কানে আবার অতি যত্নে পরানো আছে সোনার মাকড়ি। নাকগুলো চেপ্টে এঁকে বেঁকে গেছে। চোখের কোল ও গালের মাংসও শক্ত ফোলা, চোখ দুটো ঢাকা পড়ে গিয়েছে কোটরে। ঘাড়ের মাংসপেশী যেন নিয়ত আক্রমণোদ্যত ভল্লুকের মত ঠেলে হুমড়ি খেয়ে পড়েছে সামনের দিকে।

তারা বসে থাকে মুখোমুখি। আর তাদের মুখোমুখি হাঁ করে চেয়ে থাকে মাঠ, বন, সর্পিল সড়ক আর আকাশ। তাদেরই ক্লান্তি ও অক্লান্তিতে বিরতি দিয়ে দিয়ে ডাকে ঝিঁঝি।

তখন ঘামারি হয়তো বলে, 'আচ্ছা লাখুয়া, ভীমের চেহারাটা কিরকম ছিল বলতে পারিস?'

কথাটার মধ্যে কোন ঠাট্টার আভাস নেই। লাখপতি একটু ভেবে বলে, 'ঠিক বলতে পারছি না। তবে শুনেছি দৈত্যের মত। তা নইলে আর হিড়িম্বা রাক্ষসীকে মেরে ফেলেছিল?'

ঘামারি বলে, 'হুঁ, ঠিক।'

ভীম হনুমান, এদের নিয়ে প্রায়ই তারা এরকম আলোচনা করে। ইচ্ছে করে নয়। আপনি ওসব কথা তাদের মনে আসে।

কোন সময় হয়তো লাখপতি বলে, 'জানিস ঘামারি, আমার মনে হয় মহাবীর হনুমান আমাদের জরুর দেখভাল করে, আসে এখানে।'

অমনি ঘামারির ভাং নেশাচ্ছন্ন লাল চোখ দুটো ওঠে চকচকিয়ে, বলে, 'হ্যাঁরে, আমারও শালা ওরকম মনে হয়।' বলতে বলতেই আপনি আপনিই তাদের দেহের মাংসপেশীগুলি নাচতে থাকে।

তখন ঘামারি বলে, 'আমার কি মনে হয় জানিস। এ রেল-লাইনের জমিটা আমি একলাই সিরিফ গর্দানের ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিতে পারি। কেন বল তো?'

লাখপতি বলে, 'কি জানি মাইরী। আমারো শালা ওরকম মনে হয়। মনে হয়, দুনিয়াটা বেমালুম হালকা। ঘাড়ে করে নিতে পারি।'

সত্যি, দেহে তাদের এত শক্তির প্রাচুর্য, যে শুধু নেশা নয়, এমন একটা অপরিসীম ক্ষমতা অনুভব করে তারা। এই প্রচণ্ড শক্তিটা একসঙ্গে জমাট হয়ে যেন আগুনের মত ঠিকরে পড়ে তাদের চোখে। দেহ তাদের গৌরব, তাদের সব।

তখন ঘামারি হয়তো বলে, 'আয়, আর একবার লড়ি।'

লাখপতি বলে, 'সেই ভাল।'

কিন্তু আবেগবশত যেদিন লড়ে, সেদিন সময়ের কোন স্থিরতা থাকে না। অন্ধকারে শুধু দুপদাপ হঠাৎ চাপা হুঙ্কারের তীক্ষ্ণ শব্দ, জন্তুর নিঃশ্বাসের ফোঁস-ফোঁসানি রাত্রিটাকে চমকে দেয়। বিমূঢ় অন্ধকার ও নক্ষত্রখচিত আকাশ চেয়ে থাকে হাঁ করে। আর অন্ধকারেও তাদের ঘর্মাক্ত শরীরে এমন একটা চমকানি দেখা যায়, যেন পাথরের ঘর্ষণে জ্বলে ওঠে আগুনের ঝিলিক। কখনো শুধু মাথা ঠোকাঠুকি করে পরস্পর! তখন মনে হয়, লেঠেলদের লাঠি ঠোকাঠুকি হচ্ছে।

এই দৈহিক শক্তির খেলাই তাদের নেশা। তাদের মাতামাতিতে রাত্রিচর বাদুড়গুলিও দূর দিয়ে উড়ে যায়, জানোয়ারগুলি ফারাক দিয়ে পাশ কাটায়। কারণ প্রকৃতির গড়া ভয়ঙ্করের মতই তাদের তখন দেখতে হয়।

এই দশ বছর কেউ তাদের কোথাও যেতে দেখেনি। গাঁয়ের লোক জানত তাদের কেউ নেই। তারাও সেই রকমই জানত বোধহয়। কেননা তাদের মুখে কেউ কখনো অন্য কথা শোনেনি। গাঁয়ের সঙ্গে তাদের সম্পর্কও কম। কেবল মাঝে মাঝে গাঁয়ের ছেলেরা আসে তাদের কুস্তি দেখতে। তাও ভয়ে ভয়ে। তাদের এই নীরস দেহ সাধনা মানুষের কাছ থেকে তাদের সরিয়ে দিয়েছে। নীল পুজোর দিন, গাঁয়ের মেয়েরাও আসে। আর সপ্তাহে একদিন, শুক্রবার কিছু ভিড় হয়। ওইদিন হাটবার, ক্রসিং পেরিয়ে যেতে হয় হাটে, সেই জন্যই ভিড়।

লোকে যেমন জানত, তাদের কেউ নেই, তারাও সেই রকম বিশ্বাস করত। কেননা, ঘামারির বউ মরে গেছে দেশে থাকতেই। তার আর কেউ নেই। তারপর থেকে সে এখানে আছে।

লাখপতিও পিতৃমাতৃহীন। ভাইবোনও নেই। ভগবান জানে, তার বাপ-মা কি ভরসায় তার নাম রেখেছিল লাখপতি। পাঁচ বছর বয়সে তার বিয়ে দিয়ে দশ বছর বয়সে তার বাপ মা তাকে সংসারে একাকী করে রেখে গেছে। না ঘর, না ক্ষেতি জমি। ভাগ্যি ভাল, খুড়ো ছিল শিয়ালদহ লোকোর কুলি। সে বেঁচে থাকতেই জুটিয়ে দিয়েছিল কাজটা। পাঁচ বছর বয়সে বিয়ে হয়েছিল। নিয়ম হচ্ছে বর কনে বড় হলে, জোয়ান হলে গাওনা হয়। ওইটিই আসল বিয়ে। তখন থেকে স্বামী স্ত্রী একসঙ্গে ঘর করে। কিন্তু লাখপতির ভাগ্যে তাও ঘটে ওঠেনি। কি দিয়ে গাওনা হবে, বউ আসবে কোথায়।

তারপরে কাজ জুটেছে এই বাংলাদেশে। কেউ তাকে দেশে আজ অবধি ডাকেনি, সে-ও যায়নি। বউটাকে হয়তো আর কেউ ঘরে তুলেছে, কিংবা বাপ-মা বিক্রি করে দিয়েছে কাউকে। কিন্তু সেকথা দশবছরে দশবারও তার মনে পড়েছে কিনা সন্দেহ। এমন কি পাঁচ বছরের সেই স্মৃতির কণাও নেই তার মনে।

নারী সংক্রান্ত কথাবার্তা তাদের আলোচনায় খুব কম। ওদিক থেকে তারা নির্বিকার ও নির্লিপ্ত। গাঁয়ের কোন মেয়ের সাথে দেখা হওয়া ও মেশার অবসর নেই তাদের।

তারা আছে তাদের কাজ, দেহচর্চা ও মল্লযুদ্ধ নিয়ে। তারা শোনে শহরের মল্লযোদ্ধাদের কথা। তারা শহরে গেলে শহরের লোকেরা হাঁ করে তাকিয়ে থাকে তাদের দিকে।

তবু তাদের এই অসীম শক্তি ও বিশাল দেহটার মধ্যে কি যেন আটকা পড়ে আছে। যেন একটা খাঁচায় পোরা পাখি ছটফট করছে সব সময়েই মুক্তির জন্য। কিন্তু এই পরিবেশ ও দেহ ভেদ করে সে কখনোই বাইরে আসতে পারে না। এ যে কিসের বন্ধন তারা জানে না। তবু একটা দুর্বোধ্য আবেগ আসে তাদের মনে। তা-ও এতই ক্ষণস্থায়ী যে, আ ার তারা মল্লভূমিতে ঝাঁপিয়ে পড়ে। ক্লান্ত হলে পড়ে ঘুমিয়ে। ঘুম ভেঙেই গর্ব ও আনন্দভরে তাকায় পাহাড়ের বুকের দিকে, নাড়া দেয় মাংসপেশী। যেন পাথর কাঁপছে। তারপর আধঘুমন্ত, আড় মাতালের মত কাজে হাত দেয়।

দেহ প্রধান। মস্তিষ্ক যেন কোন কুলুপ কাঠি দিয়ে আটকানো, অবসাদগ্রস্ত, নিষ্ক্রিয়। হৃদয়টাও কেমন যেন আবদ্ধ অন্ধকার। এই তাদের জীবন।

এমনি অবস্থায় একদিন, হেমন্তের মাঝামাঝি এক দুপুরে গাঁয়ের ডাকঘরের পিয়ন এসে ডাকল, 'কই গো পবন-পো দাদারা।'

জবাব এল, 'এখুন দরজা নাই খোলা যাবে গো।'

পিয়নটাও অবাক হয়েছিল। চিঠি দেখে হাঁক দিল আবার, 'লাখপতি চামারিয়া কে আছেন গো আপনাদের মধ্যে?'

লাখপতি চামারিয়া? দুই মল্লবীরই উঠে এল দিবানিদ্রা ছেড়ে। তারাও ভারি অবাক।

লাখপতি বলল, 'কি হয়েছে?'

'আপনার নাম লাখপতি চামারিয়া?' এ গ্রাম্য বাঙালি পিয়ন চামারিয়া পদবীটা একটা বর্ণহিন্দুর পদবী ঠাউরেছে বোধহয়।

লাখপতি বলল, 'হ্যাঁ হ্যাঁ।'

'আপনার একটা চিঠি আছে।'

'ইংলিশ চিঠি?'

'না। হিন্দি।'

বোঝা গেল অফিসের নয়। লাখপতি আর ঘামারি মুখ চাওয়াচাওয়ি করে, মাটি কাঁপিয়ে গিয়ে চিঠিটা নিল। পড়বে কে? ঘামারি সামান্য পড়তে জানে। তবে দেহাতী অক্ষর। সৌভাগ্যের বিষয় চিঠিটা ধুলোকাদামাখা দোমড়ানো হলেও দেহাতী

ভাষায় লেখা।

পিয়ন বলল, 'ছ'মাস আগে চিঠিটা আপনাদের হেডঅফিসে এসেছে, এখানকার ঠিকানা নাই কি না? তা কি বিত্তান্ত?'

দুজনেই তাড়াতাড়ি খাটিয়া পেতে বসল পড়তে। প্রথম অক্ষরটি পড়তে প্রায় পাঁচমিনিট লাগল। পিয়ন বিদায় হল হতাশ হয়ে।

বিকালের দিকে চিঠি পড়া শেষ হলে তারা অবগত হল, চিঠিটা দিচ্ছে লাখপতির বিধবা খুড়ি। বক্তব্য, সে এবার মরবে। আশা করছে, এতদিনে লাখপতি গুছিয়ে নিয়েছে। সে যেন তার বউকে এবার নিয়ে যায়। বউ খুড়ির কাছেই আছে। তাই উপদেশ হচ্ছে, জোয়ান আওরৎ, খর নদীর নৌকা! মাঝি হাল না ধরলে এবার তরী যাবে। অতএব আর দেরি নয়।

দুজনেই তারা তাদের এবড়ো-খেবড়ো মুখ দুটো আরও ভয়ঙ্কর করে বসে রইল। জীবনে একটা বাধা এসে উপস্থিত হয়েছে। নিতান্ত আচমকা। হোক দেহের মধ্যে সীমিত তবু জীবন তাদের ওখানেই পরিপূর্ণ। দেহের নানাস্থানে কতগুলি মাংসপেশী ফুলে উঠে অস্বস্তিতে থমকে রইল।

ঘামারি বলল, 'অওরৎ?'

লাখপতি বলল, 'এখানে?'

একটা ধিক্কার দেখা দিল তাদের চোখে, কিন্তু এদিকে বিকালের অস্থিরতা মাথা চাড়া দিয়ে উঠল তাদের রক্তধারায়। কথা অসমাপ্ত রেখে নেশার ডাকে সাড়া দিতে চলল তারা। দুজনেই ঝাঁপিয়ে পড়ল নরম মল্লক্ষেত্রে।

তারপর রাত্রে যখন দুধ সিদ্ধি খেয়ে বসল দুজনে, তখন এই ভাবনা ঘিরে এল আবার তাদের মনে। দেহকে ঘিরে তাদের ঘোর স্বার্থপরতা, পৃথিবীর আর সবদিক থেকে এমনই ভাবে বিমুখ করে রেখেছে চোখ ও মন। তাদের দেহ সাধনার যে পরম আনন্দ, তাতে নিরানন্দের অন্ধকার ঘন হয়ে আসছে। এই দেহ থাকলে তার সুখ, পরমায়ু ও ভগবান। আওরৎ তো তাতে শুধু ক্ষয় ধরিয়ে দেবে।

অন্ধকারের মধ্যে পরস্পরকে একবার দেখল। তারপর স্থির হল, এটা নিশ্চয়ই মহাবীরের ইচ্ছা। সুতরাং আনতেই হবে। তবে লাখপতি তার এই দেহের ভাগ তাকে দেবে না। দুই বন্ধু এই স্থির করল। বউ থাকবে নিজের কাজ নিয়ে।

তারপর ছুটি নিয়ে লাখপতি দেশে গেল। নিয়ে এল বউ।

ছাব্বিশ বছরের এক মেয়ে, নাম তার উরাতীয়া। খুড়ি শাশুড়ির ঘরে ক্রীতদাসীর মত খেটে যাওয়া মেয়ে। স্বাস্থ্য ও যৌবনে পূর্ণ তার সুগঠিত দেহ। বেশ আঁটো, সামান্য খাটো, রংটা আধা ফরসা। রূপসী বলা যায় কিনা জানিনে। তার নিরাভরণ শরীরের পুষ্ট হাতপায়ের গোছায় একটা বিহারী রুক্ষতা, কিন্তু চোখ দুটি ভরা কালো দীঘির মত ভাসা ভাসা অথচ গভীর। আর হয়তো প্রথম স্বামী সাক্ষাতের

গোপনলীলায় একটা দুর্বোধ্য হাসি তার গালের টোলে।

একটা হলদে শাড়ির ঘোমটা টেনে সে এল লাখপতির সঙ্গে, হাতে পুঁটলি ঝুলিয়ে। এল নির্জন মাঠের বুকে, লেবেল ক্রসিং-এর ঢালু জমির কোলে গেটম্যানদের ঘরে। একদিন যাদের পদক্ষেপে ঘরটা কাঁপত, আজ আর একজনের পদসঞ্চারে সেই ঘর নিঃশব্দ, কিন্তু বিচিত্র শিহরণে, পুলকে ভরে উঠল। মল্লবীরের সাজানো গোছানো গুমটি ঘরে আলো এল, হাওয়া বইল।

ঘামারি এসে দাঁড়াল। লাখপতি দুহাতে জড়িয়ে ধরল তাকে। বুকে বুক ঠেকল। কয়েকদিনের যন্ত্রণাকাতর চাপাপড়া রক্তধারায় জোয়ার এল আবার। তারপর দুই মল্লবীর চোখ দিয়ে চেটে চেটে দেখল দু'জনকে। উজ্জ্বল হয়ে উঠল দু'জোড়া চোখ।

লাখপতি বলল, 'চল, একবার দেখা যাক।'

ঘামারি বলল, 'তুই দেখিস নি?'

লাখপতি বলল, 'ধু-স শালা, মনেই হয়নি। চল একসঙ্গে দেখিগে।'

ঘামারি : 'কি আর দেখব? আওরৎ আওরৎ।'

লাখপতি : 'তবু একবার—'

দু'জনে হাত ধরে ঘরে ঢুকল। উরাতীয়া বসে রয়েছে ঘোমটা টেনে। তারা দুজনে বসল অদূরের খাটিয়ায়। উরাতীয়াকে দেখে আর চোখাচোখি করে।

একটু পরে উরাতীয়া ঘোমটা তুলে খুব ধীরে ধীরে মুখ ফিরিয়ে তাকাল তার কালো চোখে। দুজনের সঙ্গে তার চোখাচোখি হতেই শান্ত অথচ মিঠে হাসি চমকে উঠল তার চোখে ও গালের টোলে। মাথাটি গেল নেমে, রুক্ষ খোঁপাটি ভেঙে পড়ল ঘাড়ের পাশ দিয়ে।

হাসি দেখে অবাক বিস্ময়ে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করল মল্লবীরেরা। আবার উরাতীয়ার চোখ উঠল, দূরে মেঘে যেন হালকা বিদ্যুৎ চমকালো মিঠে হাসির। বিশাল দেহে দুই বন্ধু আবার মুখ চাইল পরস্পরের।

তারপর হেসে উঠল। হাসতেই লাগল উচ্চরোলে। যেন এক রুদ্ধধারা হঠাৎ মুক্ত হয়ে অনর্গল বয়ে চলল অট্টরবে।

আর সেই অট্টরবের সঙ্গে এক বিচিত্র সুর যোজনা করল নূপুর নিক্কণের মত চাপা গলার খিলখিল হাসি, থরথর করে কেঁপে উঠল উরাতীয়ার শরীর ও ভাঙা খোঁপা।

এমনই অভাবনীয়, অচিন্তনীয় এই বিচিত্র হাসির রোল যে, প্রাগৈতিহাসিক যুগের ক্রসিং গেটের এই চারপাশের সীমা, তার বনপালা সড়ক ও আকাশ থমকে রইল এক মুহূর্ত। পরমুহূর্তেই হেমন্তের অপরাহ্ণ নেচে উঠল হাওয়ায়। ইতিহাসের যুগ ফিরে এল যেন, সমস্ত পরিবেশটায়।

আজ এল মাঠের পাব। আমনের গন্ধ, গাভীর হাম্বা রব, মাঠের মানুষের হাঁকাহাঁকি ডাকাডাকি। আর আশ্চর্য! এই কান পেটানো, নাক থ্যাবড়ানো, চাঁছা মাথা, এবড়ো খেবড়ো মুখ এই পাহাড়ে মানুষ দুটোকে দেখে একটু ভয় পেল না গেঁয়ো উরাতীয়া। সে সমান তালে হেসে হাসিয়ে এক নতুন রং ছড়িয়ে দিল এখানে। তারপর খুলে ফেলল তার পুঁটুলি।

কণ্ঠরোল থামল। কিন্তু যেন যুগ যুগান্তরের চাপা পড়া হাসি কাঁপতে লাগল মল্লবীরদের পেশীতে পেশীতে, হাসতে লাগল গর্তে ঢোকানো চোখ। নিজেদের হাসিতে তারা নিজেরাই বিস্মিত। কৌতূহলিত হয়ে তারা দেখল আবার উরাতীয়াকে।

উরাতীয়া পুঁটুলি খুলে বার করছে বাঁকমল। পরেছে পায়ে। এইটুকু তার বাপের বাড়ির সম্বল। লুকিয়ে রেখেছিল খুড়িশাশুড়ির ঘরে এসে। আসল লোকের ঘরে এসে একদিন সে পরবে, এই ছিল সাধ। আজ তা পূর্ণ হল।

মল পায়ে উঠে দাঁড়াল সে। অসঙ্কোচে ঘুরল সারাটি ঘর। আপন মনে হেসে হেসে দেখল চারদিক। রাবণের লঙ্কা পোড়ানো, গন্ধমাদন বহন, বুক চিরে দেখানো রামসীতা, এমনি ছ'সাত রকমের শুধু মহাবীর হনুমানের ছবি টাঙানো আছে ঘরটায়।

তারপর বাইরে এসে দাঁড়াল উরাতীয়া। দুই মল্লবীর বন্ধুও উঁকি মেরে দেখতে লাগল এই অদ্ভুত ব্যাপার। উরাতীয়া গিয়ে দাঁড়াল তুলসীমঞ্চের কাছে। নীচু হয়ে দেখল মহাবীর হনুমানের মূর্তি। সেখানে গড় করল। মল্লক্ষেত্রের চারপাশে দুই বন্ধু লাগিয়েছে বেল ও গাঁদার চারা। সৌন্দর্যের জন্য নয়। মল্লক্ষেত্রের পবিত্রতার জন্য। হনুমানজীর পুজোর জন্য। কয়েকটা গাঁদা ফুল ফুটেছে এর মধ্যেই।

উরাতীয়া টপাস করে ছিঁড়ল একটি ফুল। আড় চোখে দেখল দুই পুরুষকে। তারপর লাইন পেরিয়ে নেমে গেল ওপারে। গিয়ে খোঁপায় গুঁজে দিল ফুলটি।

দুই বন্ধু এগিয়ে উঁকি দিল। দেখল, উরাতীয়া ঘামারির ঘরটিও দেখছে ঘুরে ঘুরে। তার ঘোমটা গেছে খসে। বাইরে এসে দুজনের সঙ্গে চোখাচোখি হতেই লজ্জার বিচিত্র রাগে হেসে মুখ ঘুরিয়ে নিল।

আর একটা হাসির উচ্চরোল পড়ল ফেটে। কেন, তারা নিজেরাই জানে না। কেবলই হাসি আসছে, হাসি পাচ্ছে। প্রাণ চাইছে, ভাল লাগছে।

তারপর দেখা গেল তাদের গায়ে আঁচলের হাওয়া দিয়ে উরাতীয়া দুলে দুলে চলে গেল পুবের সড়কের পাশে ছোট্ট পুকুরটিতে। স্নান করে এসে কাপড় পরে খুঁজে পেতে বার করল দুধের বালতি। গাইয়ের বাঁট দেখে সে টের পেয়েছে সময় হয়েছে দুইবার। মরদগুলোর সে খেয়াল নেই। কোনদিন ছিল নাকি।

একটা নয়, ঘামারির গরুরও দুধ দুইল সে। দুয়ে অবাক-মুগ্ধ মল্লবীর পুরুষদের সামনে এসে দাঁড়াল। মুখ ফিরিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'উনুন কোথায়? আগুন দেব।'

দুই বন্ধু বিস্ময়ে চোখাচোখি করল। চোখে চোখেই তাদের কথা। পরস্পরের

চোখের দিকে তাকালেই তারা মনের ভাব বুঝতে পারে। মল্লক্ষেত্রে ঐ শিক্ষাটি তারা আয়ত্ত করেছে। তাদের চোখ বোবা জানোয়ারের মত বলাবলি করছিল, 'এসব কি হচ্ছে? সত্যিই কি আমাদের জীবনে একটা নতুন কিছু ঘটতে বসেছে? একটা কোন সর্বনাশ কিংবা সুখের ব্যাপার ঘটতে যাচ্ছে?' তবু তাদের মস্ত বুক দুটিতে একটা খুশির বন্যা পাক দিয়ে উঠছে।

ঘামারি বলল, 'তোর উনুনটা বার করে দে।'

লাখপতি বলল, 'কেন? তোরটা দে।' বলেই আবার কি হল, তারা হেসে উঠল। এক নাম না জানা মদির রসে আকণ্ঠ ভরে উঠেছে তাদের। একটা মাতলামির ঘোর লেগেছে মনে।

শুধু তাদের মাঝে হাসি উচ্ছল উরাতীয়ার গা বেয়ে যেন একটা মানুষিক মোহের ঝরণা পড়তে লাগল গড়িয়ে গড়িয়ে।

ঘামারি তেল আর ল্যাঙট নিয়ে এল। লাখপতির চাপা রক্তে লাগল ঢেউ। দুজনে ঝাঁপিয়ে পড়ল মল্লক্ষেত্রে। এতদিন শুধু মল্লযুদ্ধের জন্য মল্লযুদ্ধ হয়েছে। এতদিন শুধু নানান কায়দা ও চাপা হুঙ্কার উঠেছে ভয়ঙ্কর শক্তির ঘোরে। আর থমকে থেকেছে চারিদিকের পরিবেশ।

আজকের লড়াই উল্লসিত। আজ প্রাণখোলা উল্লাসের বান ডেকেছে মল্লক্ষেত্রে। রান্না চাপিয়ে থেকে থেকে এসে দাঁড়াচ্ছে উরাতীয়া। কখনো বাঁকা হয়ে, সোজা দাঁড়িয়ে, ঘোমটা তুলে ও খুলে, চোখ বড় বড় করে নয়তো খিলখিল হাসির বাজনা বাজিয়ে দেখছে। এই অল্প সময়ের মধ্যেই অসঙ্কোচে দিয়ে উঠেছিল হাততালি।

মাঝে মাঝে শঙ্কিত হয়ে লক্ষ্য করছে কার ক্ষমতা বেশি। আশ্চর্য! কেউ কাউকে আঁটতে পারছে না। ঘামারিকে ফেলে লাখপতি তার ঘাড়ে মাটি ফেলছে আর হাঁকাচ্ছে রদ্দা। তারপর বগলের তলায় হাত দিয়ে চেষ্টা করছে উল্টে ফেলতে। পারছে না। আবার পাল্টা লাখপতিকে নিয়ে চলল চেষ্টা। হল না!

তখন আবার হাসি। তিনজনের হাসি। এতদিন এই সন্ধ্যাবেলার উঁচু জমিটার উপরে, আকাশের কোলে দেখা যেত দুটি দানবের মূর্তি। আজ আর একটি বিচিত্র রূপের দ্যুতি মূর্তি ধরে দাঁড়িয়েছে তাদের মাঝখানে। আজ তারাও যেন ধরেছে মানুষের মূর্তি। মানুষিক স্বপ্নের ঘোর লেগেছে আজ এখানে।

তারপর দিন চলে গেল। একটা নতুন যুগের নররূপায়ণের সূচনা ঘটল এখানে।

উরাতীয়া ছোট ঘরের মেয়ে ও বউ। ক্রীতদাসী ছিল খুড়িশাশুড়ির ঘরে। নিষিদ্ধ যৌবন বাসর থেকে নিয়ত হাতছানি দিয়ে ডেকেছে তাকে। যেমন ডাকত আরও অনেককে। যেতও অনেকে। সে প্রতীক্ষা করেছিল একজনের জন্য।

এখানে এসে তার ছাব্বিশ বছরের পিপাসিত যৌবন প্লাবিত হল। সেই প্লাবনের ধারায় পলি পড়ল এখানকার মাটিতে, দুটি মল্লবীর মানুষের হৃদয়ে। সে একজনকে

দিয়ে খুশি, পেয়ে খুশি আর একজনকে। লাখপতি তার ষোলআনা জীবন ও যৌবনের দেবতা। ষোল আনার হিসেবের পর যেটুকু মানুষকে করে নিঃশঙ্ক, বুকে আনে বল, তার সেটুকু হল ঘামারি। ঘামারি তার সহচর। তারা তার প্রেম ও প্রীতি, ভালবাসা ও সৌহার্দ্য, সুখ ও দুঃখ।

দেবতা ও সহচর, দুই মল্লবীরের মনে সে বোধ ছিল না। অবোধ খুশিতে রচিত হয়েছে তাদের নতুন জীবন। তারা এতদিন শক্তি অনুভব করেছে মাংসপেশীতে। এবার হৃদয়ে হৃদয়ে। তাদের বিশাল শক্তিশালী শরীরের মধ্যে যে বন্দী বিহঙ্গটা এতদিন ছটফট করেছে, সে অকস্মাৎ মুক্ত হয়ে ঝাঁপ দিয়ে স্নান করে নিল এক মুক্ত ফল্গুধারায়। জানত না, বন্দীর এই মুক্ত ফল্গুধারা হল উরাতীয়া।

এখন কুস্তির শেষে, যখন তারা দুজন দুধ সিদ্ধি খেয়ে হাওয়ায় বসে দোলে, তখন তাদের মাঝখানে এসে বসে উরাতীয়া। আগে তাদের মস্তিষ্ক থাকত অবসাদগ্রস্ত আর শরীরে বইত রক্ত। এখন মস্তিষ্কের একটা নতুন টঙ্কার অনুভূত হয়।

উরাতীয়া বলে ঘামারিকে, 'তারপর সেকথাটা বল। তোমার বউ কেমন করে মরল?'

মহাবীর, ভীম নয়, কুস্তি কায়দা নয়, বউয়ের কথা। ঘামারি বলল, 'কি আর বলব।'

লাখপতি বলে, 'বল না। আমি তো কোনদিন শুনিনি?'

উরাতীয়া ব্যথা পায়, অবাক হয়। বলে, 'সচ্! ওমা এত বন্ধুত্ব আর একথাটা কোনদিন বলা কওয়া হয়নি?'

অমনি ঠোঁট ফুলিয়ে অভিমান ভরে বলে উরাতীয়া, 'যাও! তোমরা যেন কি?'

বলতে বলতে চোখ ছলছলিয়ে ওঠে তার। আর ওই কথা, ওই জলটুকু তাদের গলায় একটা বিস্মিত ব্যথা ও আনন্দের গোঙানি এনে দেয়। সত্যি তারা অনেক কথা এতদিন বলেছে, হেসেছে। কিন্তু এমন বিচিত্র হাসি ব্যথা ও আনন্দ, এত অজানিত সুখ দুঃখ হৃদয়ের ছোটখাটো অসামান্য বিষয়ের আদান প্রদান হয়নি।

অনেক কথা, অনেক হাসি, এমন কি কোন কোন রাতে মোটা ও হেঁড়ে গলায় বেসুরো গান পর্যন্ত শোনা যায়।

ধোকে কে নিউ'পর
ইমারৎ নহি বনতে।।

অর্থাৎ মিথ্যার ভিতে সত্য দাঁড়ায় না। এ গানটা লাখপতি শুনেছিল কোন কালে মাইনে আনতে গিয়ে জংশন স্টেশনে। হনুমানের কীর্তিগাথা নয়, হিড়িম্বা বধের কাহিনী নয়, একেবারে সত্য কথা। তাও এতদিন পরে।

বেসুরো ও হেঁড়ে গলার জন্যও তাদের তিনজনের হাসির অন্ত ছিল না। কখনো ঘামারি সব উদ্ভট হাসির গল্প করে। ছেলেমানুষের মতো উৎকট অঙ্গভঙ্গি করে

নাচে। কোন কালে দেখা সিনেমার নায়ক নায়িকার অভিনয় করে দুজনে দেখায় উরাতীয়াকে।

উরাতীয়া হেসে বাঁচে না। বলে, 'ছি ছি! দূর দূর!' তারপর আদুরে মেয়ের মতো বলে, 'আবার দেখাও না?'

আর দুই মল্লবীর তাই করে। পবন-পোয়েরা যে এত সরল ও হাসিউচ্ছল তা জানত না গাঁয়ের মানুষেরা। রাক্ষসের মূর্তির মধ্যে মানুষের দেখা পেয়ে, তারাও যাওয়া আসা করতে থাকে।

কিন্তু তাদের দশ বছরের ঘুণধরা রক্তে লুকিয়েছিল এক ভয়ঙ্কর বিষধর। লুকিয়েছিল নিতান্ত দেহসাধক, সংসার ও ভালবাসাবিমুখ মল্লযোদ্ধাদের মনের অগোচরে। সুযোগ বুঝে সে কুণ্ডলীর পাক খুলতে লাগল।

এত সুখ কথা ও হাসি। এত বন্ধুত্ব। তবু মল্লযোদ্ধাদের কোথায় চাপা ছিল আগুন, সে এবার থেকে জ্বলে জ্বলে উঠল আড় কটাক্ষে, শুধু চোখে চোখ। চোখে চোখ ভাব বিনিময়ে ছিল তারা দুরন্ত ও অভ্যস্ত। আজও তার ব্যতিক্রম হল না।

যে মুক্ত ধারায় স্নান করে তারা দুদিন হেসেছিল অনর্গল, সে হাসি আড়ষ্ট হয়ে গেল। ওই মুক্ত ফল্গুধারাটা তাদের কাছে শুধু ছাব্বিশ বছর বয়সের একটি যৌবন কলঙ্কিত দেহ। মুক্ত আনন্দ, পাশব কামনার একটি যন্ত্র। দশ বছর ধরে তারা শুধু দেহের সেবা করেছে, দেহকে ভালবেসেছে। দেহাশ্রিত প্রবৃত্তি বার বার তাদের ওই দিকে অঙ্গুলিসঙ্কেত করল। তাদের বন্ধুত্বের বন্ধন কবে ছিঁড়ে গেছে টেরও পায়নি। যে ভয়ঙ্কর দৈহিক শক্তি তাদের মিলনের সূত্র ছিল, আজ তা পরস্পরকে আক্রমণে উদ্যত করল।

তারা মুখে কিছু বলল না। কিন্তু একজনের চোখ, 'খবরদার! এদিকে নয়।' আর একজনের 'নয় কেন?'

কিন্তু তারা লড়ে রোজ। খায় একসঙ্গে, গল্প করে। তবু যেন জমে না। হাসিটা যেন ধাক্কা খেয়ে খেয়ে বেরোয় গলা থেকে।

অবাক হয় উরাতীয়া। সব না বুঝলেও এটা বোঝে অদৃশ্য কী যেন ঘটছে। ওরা হঠাৎ এমন করছে কেন? জিজ্ঞেস করলেই ওরা দুজনেই বোকার মতো হেসে ফেলে। আসর জমে উঠতে চায়। উঠতে পারে না।

সেই প্রাগৈতিহাসিকতা আরও নিষ্ঠুর রূপে যেন ফুটে উঠছে। অবাক হয়ে চেয়ে দেখে উরাতীয়া। বোঝে না, কেবল আড়ালে নিঃশব্দে কেঁদে মরে। ওরা আমার দেবতা ও সহচর। ওরা দুদিন হাসল। কিন্তু আমি আসার আগেও কি ওরা এমনিই ছিল? মনে হয়নি তো? তবে?

ঘরের মধ্যে রাত্রে লাখপতির চেহারাটা বদলে যেতে লাগল। তার সোহাগ হয়ে উঠল নিষ্ঠুর। আদর হয়ে উঠল ভয়ঙ্কর। অসহ্য আদরে সোহাগে উরাতীয়ার দেহটার

উপরে একটা ভয়ঙ্কর প্রতিশোধের আকাঙ্খা যেন তার।

আর ঘামারি সেই সময়, অনেক রাত্রে ঢালু সড়কের পাশ থেকে উঠে আসে একটা ক্ষিপ্ত ভল্লুকের মতো। দাঁড়িয়ে থেকে লাখপতির বন্ধ ঘরটার দিকে। যন্ত্রণা-কাতর জানোয়ারের মতো বুক থেকে ফেটে পড়া শব্দটাকে চেপে ধরে কণ্ঠনালিতে। কান পাতে দেয়ালে।

কোন শব্দ নেই। মাঘের উত্তরে হাওয়া তার গায়ে ও দেওয়ালে ধাক্কা খেয়ে যায়।

শুকিয়ে উঠল উরাতীয়া। লাখপতিকে তার কিছু অদেয় ছিল না। ঘামারির একাকী জীবনের বেদনাই ছিল তার প্রীতি ও সৌহার্দের গৌরব।

আড়ালে যদি সে জিজ্ঞেস করে লাখপতিকে, 'কি হয়েছে তোমাদের?' লাখপতি শুধু চেয়ে থাকে। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে উরাতীয়ার সর্বাঙ্গ, তারপর হঠাৎ খপ্ করে উরাতীয়াকে ধরে ভয়ঙ্কর আদরে দলা পাকিয়ে ফেলে। সে আদরে শুধু একটা অসহ্য যন্ত্রণা অনুভূত হয় রক্তের মধ্যে।

ঘামারিও যেন তেমনি। জিজ্ঞেস করলে তেমনি করে চেয়ে থাকে।

কিন্তু গায়ে হাত দেয় না। দিতে চায় যেন। উরাতীয়া ভয় পায়।

একই রকম দুজন। একই চাউনি ও চেহারা। কাছাকাছি থাকলেও একসময় আলাদা করা যায় না ওদের। একই চালে ওরা দুজন চলেছে।

তবু ওরা লড়ে। তবে মহাবীরকে প্রণাম করে হাত মেলায়, তারপর লড়ে। তবু ওদের চোখে চোখ মিললেই, পাথরের ঘর্ষণে যেন আগুন ঠিকরোয়। লড়তে লড়তে ক্ষিপ্ততা দেখা দেয়, মুহুর্মুহু নতুন নতুন আক্রমণ চালিয়ে যায়।

উরাতীয়া যেন কেমন করে বুঝতে পারে, লড়াইটা অন্যপথ ধরেছে। এই কয়েক মাসের মধ্যে বুঝেছে। সে বাধা দেয়, থামতে বলে।

ওরা থামে। ছেড়ে আসে মল্লক্ষেত্র। কিন্তু ওদের ভেতরে দুটো জানোয়ার ফুঁসতে থাকে। উরাতীয়াকে মাঝখানে রেখে অনেকক্ষণ ধরে তারা শান্ত হতে থাকে।

কিন্তু এই অবস্থাও আর রইল না। হঠাৎ লাখপতি একদিন ঘামারির উনুনটা লাথি মেরে ভেঙে ফেলল।

ঘামারি বলল, 'ভাঙলি যে?'

লাখপতি জবাব দিল, 'ওটা পুরনো হয়ে গেছে।'

ঘামারি খেতে এল না। লাখপতি বলল, 'খাবিনে?'

ঘামারি জবাব দিল, 'না। তোদের রান্না ভাল লাগে না। নিজে রাঁধব।'

আশ্চর্য শান্ত তাদের কথাবার্তা। বিকেলবেলা দুধ দুইতে গিয়ে উরাতীয়া দেখল ঘামারির গরু নেই। জিজ্ঞেস করল, 'গাই কোথায়?'

—'মাঠে।'

—'দুইতে হবে না?'

'না' বলেই হঠাৎ ঘামারি দু'হাত বাড়িয়ে দিল উরাতীয়ার দিকে। এই প্রথম। উরাতীয়া দেখল, রাত্রের বন্ধ ঘরের ক্ষিপ্ত স্বামী লাখপতি যেন তার সামনে দাঁড়িয়ে। এতদিন ছিল চাপা বেদনা ও অপমান। আজ তার চোখে দেখা দিল রাগ আর ঘৃণা। নিঃশব্দে পালিয়ে এল সে। নইলে ঝাঁপিয়ে পড়বে এখুনি।

তারপর এপার ওপার হল। দুটো সংসার হল। কেবল দেখা হয় মল্লক্ষেত্রে। এসে দেখে উরাতীয়া। বসে হাসে, কথা বলে কিন্তু একটা রুদ্ধশ্বাস গুমসোনি নিয়ে নেমে আসে আকাশটা।

লড়াইয়ের শেষে উরাতীয়া দেয় দুধ আর সিদ্ধি। ওরা খায়।

হয়ত লাখপতি বলে, 'হিড়িম্বাকে কিভাবে মেরেছিল ভীম?'

ঘামারি : 'টুটি ছিঁড়ে।'

উরাতীয়া কেঁপে উঠে বলে, 'ওসব কথা থাক।' শঙ্কিত অথচ আদুরে গলায় বলে, 'গান গাও তোমরা একটু, আমি শুনি।'

'গান!' বিদ্রূপের মতো শোনায় যেন কথাটা। আর উরাতীয়ার দুই চোখ বেয়ে জল পড়ে। কিন্তু জগৎবিমুখ, দেহাশ্রিত এই মল্লযোদ্ধাদের বুকে জেগেছে যে অজগর, সে ফুঁসছে দিবানিশি।

মুক্ত ফল্গুধারায় স্নান করেই শেষ হয়েছে। মুক্তিটাকে দেহের মতো লুফে নিতে চাইছে তারা।

শীত গেছে। বসন্ত এসেছে। রাত এসেছে। ঢালু সড়কে ধুলো উড়ছে। গাছগুলি পাগল হয়েছে।

সেদিন শেষ গাড়িটা যায়নি তখনো। লড়াই শেষ করে বসেছে দুইজন। পরস্পরকে বার বার আক্রমণ করছে তারা। এমন কি, আইন ভঙ্গ করে আঘাত করছে। সে জন্য ঘামারির কাপালটা উঠেছে ফুলে আর লাখপতির ঠোঁটের কষে রক্ত।

উরাতীয়া নিয়ে এল দুধ সিদ্ধি। বুক ফেটে যাচ্ছে এই দুই বন্ধুর লড়াই দেখে। তার জন্য ওরা পরস্পরকে ঘৃণা করছে, লড়ছে। কিন্তু কেন, কেন? সে ওদের বুক ভরে নিয়েছে, ওরা কেন পারছে না। তবু হাসতে চাইল, আর চোখ ফেটে জল এল। "ভগবান। ওরা মানুষ চেনে না। ভাল বাসে না, হাসে না। আমি হাসতে হাসতে এলাম, ওরাও দুদিন হাসল। তারপরে এই যন্ত্রণা। সে কি শুধু আমি? তবে ক্রীতদাসী আমি ছিলাম ভাল।"

দুধের পাত্র এগিয়ে দিল লাখপতির দিকে। কিন্তু চকিতে কি ঘটে গেল, গেলাসটা নিয়ে লাইনের ওপর ছুঁড়ে ফেলে দিল লাখপতি। মুহূর্তে কিসের এক সংকেত, দুই মল্লযোদ্ধাই চকিতে উঠে দাঁড়াল। পরস্পরকে দেখল কয়েক মুহূর্ত। তারপর দুজনেই দু'দিক থেকে গিয়ে দাঁড়াল মল্লক্ষেত্রে।

উরাতীয়া ব্যাকুল গলায় বলল, 'আর না, আর লড়ো না।'

কিন্তু ততক্ষণে একটা আচমকা রদ্দা মেরে ঘামারিকে ছিটকে ফেলেছে লাখপতি। কিন্তু চকিতে ঘামারি লাফ দিয়ে উঠেছে। তারপর পরস্পর ঝুঁকে দুজন কয়েকবার নিঃশব্দে পাক খেল চারপাশে। অন্ধকারেও তাদের জ্বলন্ত চোখ দেখছিল পরস্পরকে।

উরাতীয়া ছুটে এল মল্লক্ষেত্রের মাঝখানে, 'পায়ে পড়ি, ওগো পায়ে পড়ি, থামো।'

কিন্তু তাকে এড়িয়ে বনবেড়ালের মতো নিঃশব্দ উল্লম্ফনে ঘামারি লাখপতির পা দুটো ধরে, তাকে নিয়ে সশব্দে পড়ল মাটিতে। আর তাদের দেহের ধাক্কায় লাইনের তারের কাছে ছিটকে গেল উরাতীয়া। চিৎকার করে উঠল, 'থামো!'

থামবে না। প্রাগৈতিহাসিক জানোয়ার দুটো আজ ইতিহাসের যুগকে তরান্বিত করার জন্য নিজেদের বোধহয় শেষ করবে। দেখা গেল, লাখপতির পা ধরে পাক দিচ্ছে ঘামারি, শূন্যে তুলে আছড়ে ফেলতে চাইছে। কিন্তু লাখপতি আঁকড়ে ধরে আছে মাটি। পরমুহূর্তেই আবার দেখা গেল, দুজনেই জাপটা জাপটি করে গড়াগড়ি দিচ্ছে, হুঙ্কার ছাড়ছে, পরস্পরের গলা টিপে ধরার চেষ্টা করছে। তারপর দেখা গেল, একজনকে চিৎ করে ফেলে গলা টিপে ধরেছে একজন। আর একজন দু পায়ের মাঝখানে চেপে ধরেছে গর্দান। আর একটা গোঙানি।

দূর থেকে একটা আলো এসে পড়েছে মল্লক্ষেত্রে। কিন্তু আমৃত্যু এই হিংস্র লড়াই। সেই আলোয় উরাতীয়া দেখল, পাথরে পাথরে ঘর্ষণ হচ্ছে। রক্ত ঝরছে পাথরের গায়ে।

আলোটা ক্রমে তীব্র হচ্ছে। শেষ গাড়িটা আসছে। উরাতীয়া মরিয়া হয়ে ওদের দুজনের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল, তার নরম হাতে আঘাত করল, চিৎকার করে উঠল। 'থামো, থামো বলছি।'

কিন্তু তাদের পরস্পরের পেষণে শুধু তীব্র গোঙানি। ছিটকে যাচ্ছে মাটি। খাদ হয়ে যাচ্ছে মল্লক্ষেত্র।

উরাতীয়া অস্থির অসহায় ভাবে উঠে দাঁড়াল। মরবে, হয়ত দুজনেই মরবে তার চোখের সামনে। শুনবে না, কিছুতেই শুনবে না।

এই ভয়ঙ্কর দৃশ্য থেকে চোখ ফিরিয়ে সে অপলক দীপ্ত চোখে তাকিয়ে রইল দ্রুত এগিয়ে আসা আলোর দিকে। অসহ্য ঘৃণায় অপমানে, বেদনায় ও অভিমানে অভিশাপ দিতে চাইল সে। দিতে গিয়ে আরও জোরে কেঁদে উঠল। আর একবার ওদের দিকে দেখে চোখে হাত দিল। গাড়ির শব্দটা কানের কাছে বেজে উঠে মাটি কাঁপিয়ে তুলতেই ঝাঁপিয়ে পড়ল সে লাইনের উপর।

তারপর একটা তীব্র চিৎকার, এঞ্জিনের গায়ে ধাক্কা খেয়ে চূর্ণবিচূর্ণ মাথাটা নিয়ে সে আবার ছিটকে পড়ল মল্লক্ষেত্রের সামনে। গাড়িটার শব্দের সঙ্গে সঙ্গে হারিয়ে গেল পেছনের রক্ত ক্রুদ্ধ চোখের মতো লাল আলোটা।

হয়ত উরাতীয়ার মৃত্যু চিৎকারটা তাদের পাশবিক মল্লযুদ্ধের চেয়েও তীব্র ও ভীষণ জোরে বেজে উঠেছিল। হঠাৎ মল্লযোদ্ধাদের দুজনেরই হাত শিথিল হয়ে এল। দুজনেই তারা ছেড়ে দিল পরস্পরকে। দুজনেই উঠল, দুজনেই ফিরে তাকাল উরাতীয়ার শরীরের দিকে। মুহূর্তে চমকে, দুজনেই টলতে টলতে এসে বসল উরাতীয়ার দুপাশে। তাদের মতো ভয়ঙ্কর মানুষরাও দারুণ আতঙ্কে যেন শিউরে ডুকরে উঠল।

কে লাখপতি, কে ঘামারি, আর তাদের চেনা যায় না। তারা একরকম দেখতে, একই তাদের কণ্ঠস্বর। একজনেই দুজন।

একজন দূর থেকে চাপা গলায় ডাকল, 'উরাতীয়া।'

অন্ধকারে চক চক করছে উরাতীয়ার সর্বাঙ্গের রক্ত। সে নিঃশব্দ, নীরব। সে মারা গেছে।

This Book Downloaded From

আর একজন ডাকল, 'উরাতীয়া।'

http://Doridro.com

কোন শব্দ নেই। তারা আবার দেখল পরস্পরকে, আবার উরাতীয়াকে। তারপর ভূমিকম্পের পাথরের মতো কেঁপে উঠল তাদের বিশাল শরীর দুটো। বোবা করুণ অসহায় জীবের মতো কাঁপতে লাগল। আর রক্তে ও চোখের জলের নোনা স্বাদে ভরে উঠতে লাগল মুখ। তারা আবার ডাকতে চাইল, 'উরাতীয়া!' কিন্তু পারল না। শুধু বুকে বাজতে লাগল, উরাতীয়া! উরাতীয়া!

একদিন তারা দেহাশ্রিত বদ্ধ জীবনবোধে আশ্রয় নিয়েছিল এখানে। তারপর মুক্তি এসেছিল, তারা হেসেছিল, গান করেছিল। তাদের ঘাম ঝরেছিল একদিন। আজ রক্ত পড়ল, চোখের জলে ভিজল মাটি।

শুধু নিথর পড়ে রইল সেই মেয়ে উরাতীয়া। বুকে বাজল তার নাম। বাজতে লাগল, বাজতে থাকবে হয়ত চিরদিন, যতদিন না সে আবার এসে হাসবে, কথা বলবে। তেমনি বাজতে লাগল, আর দূর দক্ষিণের পাগলা হাওয়া হা হা করে ছুটে এল।